রবীন্দ্র অন্বেষনে
শম্ভু মিত্র

— এক —

অনেকদিন আগের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন বেঁচে আছেন। শিশির ভাদুড়ি তাঁর যোগাযোগ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করাবেন, সেই বিষয়েই দুজনের কথা হচ্ছিল। শিশির ভাদুড়ি মূল উপন্যাসের শেষটুকু বদলে দিতে চান। মূল উপন্যাসে ছিল কুমু পালকি চড়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। সেই চলে যাওয়ার নিরুপায় বেদনা হাহাকারের মত বাজতে লাগল সকলের বুকের মধ্যে। শিশিরবাবু দেখাতে চান বাড়ি ফিরে মধুসুদনের সঙ্গে কুমুর দেখা হল। দেখা হতে কুমু মধুসূদনের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করছে; যেন এই বিনম্র প্রণামের দ্বারা মুছে দিতে চাইছে এতদিনের এত মান অভিমানের পালা। আর এই দীর্ঘায়িত প্রণামদৃশ্যের উপর ধীরে ধীরে নেমে আসবে যবনিকা, এবং হাততালি। বলা বাহুল্য এইরকম উপসংহার রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হবার নয়, হচ্ছিলও না। তিনি বলছিলেন তাতে কুমুর সমস্ত চরিত্রটাই তো বদলে যাবে। কারণ মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর সংঘাত তো থিয়েটারি মান অভিমান নয়, তার মূলে আছে দুজনের স্বভাবের গভীরে। কিন্তু শিশিরবাবু নাছোড়বান্দা। তাঁর যুক্তি সনাতন দাম্পত্যের জয় না দেখালে লোকে এ থিয়েটার নেবে না। আর তাঁকেও তো টিকিট বেচেই চালাতে হবে, অতএব..। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাট্যাচার্যের আবদার মেনে নিলেন, বললেন, যাকগে, যা চাও কর। তোমার থিয়েটার তো দুদিন পরে লোকে ভুলে যাবে। আর আমার যোগাযোগ থাকবে চিরকাল। ইদানিং সিনেমায় সিরিয়ালে রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ দুর্গতি যখন চোখে পড়ে তখন এই গল্পটার কথা মনে হয়। আবার ভাবি যাঁরা সত্যিকারের বড় লেখক যুগে যুগে নানা ভাবে বিভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁরা ব্যাখ্যাত হন। অপব্যাখ্যা থাকে, বিচ্যুতি থাকে, তাঁদের নিয়ে নানারকম ছেলেখেলাও হয়। আবার তারই মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আর একটা স্রোতও বয়ে চলেছে সেটা হল ব্যক্তিভেদে, যুগভেদে, দেশভেদে তাঁদের রচনার মধ্য থেকে নূতন নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করা, যেন সেই একটি মৌলিক উৎস থেকে অনেকগুলি ধারা উদগত হচ্ছে। যারা প্রত্যেক আলাদা। ভষভূতি বা মাইকেল মধূসূদনের রামচন্দ্র বাল্মীকির রাম নন। রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ মহাভারতের কচ - দেবযানী উপাখ্যান নয়। সাত্যিসংসারে এ ধরনের উদাহরন এত বেশী আছে যে অধিক প্রমাণ নিষ্প্রযোজন। মহৎ রচনার আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল তার সমালোচনাও নানা দৃষ্টিকোন থেকে করা যায়। এবং অন্ধের হস্তীদর্শনের মত কোনও ব্যাখ্যাটিই মিথ্যাও নয়, চরম সত্যও নয়। বুদ্ধদেব বসু যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতের নায়ক বলে প্রতিপন্ন করেন। আবার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি ঐ গৌরব দেন অর্জুনকে। উভয়ের যুক্তিই অকাট্য। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চর্চা করেছেন তাঁরাও এইরকম ভাবে তাঁর মধ্যে নানারকমের তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, এবং ভবিষ্যতেও করবেন। এই প্রক্রিয়াটি যেহেতু কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতিনির্ভর একটি প্রক্রিয়া, সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা নিজ নিজ চিন্তাধারা রুচি ও অন্তঃপ্রকৃতিকেও পাঠকের কাছে খুলে ধরেছেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করেছেন, এবং একই সঙ্গে নিজেরাও ব্যাখ্যাত হয়েছেন। শম্ভু মিত্র (১৯১৫ - ১৯৯৭) এই ধারারই অন্যতম গুনীজন।

— দুই —

শম্ভু মিত্রের বাল্য, কৈশোর, ও প্রথম যৌবন কেটেছিল দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী পরাধীন ভারতে। তখনকার দিনের ঈষৎ সাবেকি মনোভাবাপন্ন, সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার গুলিতে রবীন্দ্রচর্চা বিশেষ হত না। অল্প বয়সে সেইজন শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। যখন তিনি বছর দশেক বয়সের স্কুলের ছাত্র সেই সময় একবার ডাকঘর অভিনয় দেখেছিলেন একথা তাঁর মনে পড়ে। দেখে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। ভালও লাগেনি। অল্পকাল পরে একবার তাঁর হাতে এল রক্তকরবী বইখানা। বালক বয়সে এ বই পড়ে তাঁর পছন্দ হয় নি। গোড়াতেই তিনি বাধা পেলেন কিশোরের 'নন্দিনী', নন্দিনী নন্দিনী" বলে তিনবার আহবানে। সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে কদাচ ওভাবে ডাকে নাকি? এ যে ঘোরতর কৃত্রিম। অথচ ঐ নাটকেরই কোনো কোনো কথা আলাদাভাবে তাঁর খুব ভালো লেগে গিয়ে গিয়েছিল। যেন বিদ্যুচ্চমকের মত লেগেছিল। অথচ তার তলকূল কিছু বুঝে উঠতে পারেন নি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়টা ছিল অস্পষ্ট। বরং তাঁর ভালো লাগত রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করতে। যিনি তাঁকে আবৃত্তি শিখিয়েছিলেন তাঁর একটি কথা তাঁর খুব মনে ধরেছিল। একদিন তিনি আবৃত্তি করছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতা। তার একটি লাইনে ছিল ''রুনুঝুনু রবে বাজে আভরন''। তাঁর শিক্ষক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'আঃ আভরণ বাজছে রুনুঝুনু আর তুমি সেটা পড়ছ-'রুনুঝুনুরবে বাজে আভরন'। সেই তাঁর প্রথম শিক্ষা হল যে কবিতা বলতে হলে প্রথমে তার ভিতরকার মানেটুকু আগে বিবেচনা করে বলতে হয়। সে কালে সব ভারি ভারি কবিতা আবৃত্তি হত, যেমন, পঞ্চনদীর তীরে/ বেনী পাকাইয়া শিরে; কিংবা একথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাজাহান, অথবা আবার আহবান/ যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ/ দীর্ঘ দিনমান ইত্যাদি। নজরুলের কবিতারও খুব চল ছিল। তখন মাইক ছিল না। তাই গলা আলাদা রকম গম্ভীর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টেনে টেনে কবিতা বলতে হত। তিনিও তাই করতেন।

ইতিমধ্যে মাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর বাড়িতে তিনি সাবালক বলে গৃহীত হলেন। এবং থিয়েটার দেখা বিষয়ে গুরুজনদের অনুমতি পাওয়া গেল। তখন তিনি প্রাণ ভরে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে দিনকতক ধরে থিয়েটার দেখে বেড়ালেন - দিগ্বিজয়ী, আলমগির, রমা পল্লিসমাজ) প্রভৃতি, এবং যথাবিহিত খুবই মুগ্ধ হলেন। বিশেষত: শিশিরকুমারের অভিনয় তাঁকে পাগল করে দিল। তাঁর কেবল মনে হত সাধারণ কথাকে অনেক গভীর করে কিভাবে বলেন এঁরা। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন ঐরকম করে বলবার জন্য উচ্চারণ ও গলা তৈরি করতে হবে। তখন আরম্ভ করলেন বাড়িতে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাটকের আবৃত্তি। তাঁর আদর্শ ছিলেন বিশেষ করে শিশির কুমার। তাঁর এই সময়কার পাঠ্য তালিকায় সমকালের অন্য নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনও ছিল । এই তাঁর প্রথম নাট্যচর্চা।

এর পর কিছুদিনের জন্য তিনি কলকাতা ছেড়ে উত্তরপ্রদেশ চলে গিয়েছিলেন। সেখানে বন্ধুবান্ধব বিশেষ ছিল না। একলা বাড়িতে বসে নানারকম বই পড়তে পড়তে তিনি অনুভব করলেন তাঁর মনের মধ্যে নিঃশব্দে একটা রূপান্তর হয়ে চলেছে। তাঁর রূচি ও পছন্দ অপছন্দ একটা বিশেষ আকার নিচ্ছে; দেশ বিদেশের বড় বড় লেখকেরা, বিশেষত: নাট্যকারেরা তাঁকে অজান্তে তৈরি করে তুলেছেন তাঁর ভবিষৎ কর্মের জন্য; এবং এই পরিবর্তিত মানসিকতায় রবীন্দ্রনাথ জুড়ে বসেছেন অনেকখানি জায়গা, তাঁর নাটক এবং কবিতা দুটি নিয়েই।

প্রথমে আসি কবিতা আবৃত্তির কথায়। এর আগে তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুগম্ভীর কবিতাই আবৃত্তির উদ্দেশ্যে শিখেছিলেন। এখন দেখলেন অন্য রকমের আবৃত্তিযোগ্য কবিতাও রবীন্দ্রনাথের অনেক আছে। যেমন, ''আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক'', কিংবা ''হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি'', অথবা ''আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি'' ইত্যাদি, এইসব কবিতা টেনে টেনে পড়বার নয়, চেঁচিয়ে তো নয়ই। এদের ছন্দদোলায় লুকিয়ে আছে এক ধরনের আনন্দ। ঐ স্বত:স্ফূর্ত আনন্দই কবিতাগুলির প্রাণ। তিনি নিজেই ভাবানুযায়ী এগুলি বলা অভ্যাস করলেন। করে বুঝলেন এ সব কবিতার অন্তরাত্মা তাঁর আবৃত্তিতে প্রকাশ হচ্ছে। এতে তাঁর এত আনন্দ হল যে ভাবলেন বেঁচে সুখ আছে। রবীন্দ্র কবিতায় আবৃত্তির একটা নতুন ধারা এইভাবে তাঁর দ্বারা চালু হল। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথাএই সূত্রে বলে রাখি। অনেকেই জানেন ''হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি'' (উদাসীন) কবিতাটি ব্যক্তিগত ভাবে শম্ভু মিত্রের খুব প্রিয় ছিল। জীবনের নানা সময়ে এটি তিনি আবৃত্তি করেছিলেন। পুরনো কালের রেকর্ডে, শম্ভু মিত্রের যখন খুব অল্প বয়স, তখনকার গলায় এ কবিতার যে পাঠ আছে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন আনন্দ উপচে পড়ছে, যেন হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছেন আলোয়, হাওয়ায়, সুখে ও স্বাধীনতায়। আবার প্রৌঢ় বয়সে দিনান্তের প্রণাম নামক যে যুগ্ম কাসেট বার হয়েছিল সেখানে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পাঠ আমরা পেয়ে যাই। শম্ভু মিত্রের শেষ জীবন সুখের ছিল না। ভাগ্যের প্রহার তাকে নানা দিক দিয়ে পর্যুদস্ত করে সর্বস্বহারা চাঁদ বনিকের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি সত্যি সত্যিই সব ছেড়েছেন। হাল ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র নিজের আদর্শটিকে সম্বল করে স্বেচ্ছানির্বাসনে বসে আছেন। ওইরকম একজন মানুষের মনে যে বৈরাগ্য আছে কবিতাটিতে সেটাই ব্যক্ত হয়। মনে হয় আকাশ এখানে স্তব্ধ। আলোক ম্লান। সারা জগতে অপার শান্তি। কবিতাটি পুরো বলা হয়ে যাবার পর রীতি ভেঙে শম্ভু মিত্র আবার প্রথম ছত্রটি উচ্চারণ করেন; আর এই দ্বিতীয় উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তিটি হয়ে ওঠে একান্ত ব্যক্তিগত, একই সঙ্গে যিনি লিখেছেন এবং যিনি বলেছেন দুজনেরই মনের কথা। এখানে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন উদাসীন কবিতার ক্ষেত্রে কোন ব্যখ্যাটা সত্য। প্রথমটি না পরেরটি, তাহলে তার কোনো সদুত্তর হয় না।

আবার পুরনো কথায় ফিরি। উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে শম্ভুমিত্র ভূমেন রায়ের সুপারিশে সাধারণ রঙ্গালয়ে ঢুকলেন। তখন যে সব নাটক চলছিল যথা, মালা রায়, রত্নদীপ, জীবনরঙ্গ প্রভৃতি সে সবে অভিনয় করলেন। শিশির ভাদুড়ির সঙ্গে পরিচয় হল। সেই অসামান্য অভিনেতার কাছে শিখলেনও অনেক কিছু। কিন্তু তা সত্বেও তাঁর মন ভরল না। সাধারণ রঙ্গালয়ের চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর নাট্য নির্মানের আকাঙ্খা পূর্ণ হবার নয়।

তখন গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন (১৯৪৩) এদের সঙ্গে করলেন জাবাবন্দি, নবান্ন প্রভৃতি। গণনাট্য সংঘের দল তখন জনসংযোগের জন্য গ্রামে গ্রামে খুব ঘুরত। সেই ভ্রাম্যমান ইউনিটে যোগ দিয়ে শম্ভু মিত্রও দিনকতক বাংলায় গ্রামাঞ্চলে নাটকের হালচাল দেখে বেড়ালেন। স্থানীয় শিল্পিদের সঙ্গে পরিচয় হল। গ্রামের মানুষের চাহিদা বুঝতে লাগলেন একটু একটু করে। এবং তখন থেকেই তাঁর মনে সন্দেহ জাগতে লাগল গ্রামের মানুষের রুচি পছন্দ সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়নটা বোধহয় তাঁরা করছেন না।

তখনকার দিনে গণনাট্যসংঘ যে সব নাটক করতেন তা ছিল সবই মোটা দাগের নাটক। পটভূমি ও কুশীলব দুইই ছিল গ্রামীন। চরিত্রগুলির ভাষা বাঁকা, উচ্চারণ অশুদ্ধ। এদিকে শম্ভু মিত্র অনেকদিন ধরে অনেক যত্নে মার্জিত গলা ও পরিশীলিত উচ্চারণ অভ্যাস করে এসেছেন। তিনি দেখলেন এ সব নাটকে তাঁর শিক্ষা কোনো কাজে লাগছে না। যাই হোক তিনি দক্ষ নট। দু দিন চেষ্টা করে গ্রাম্য উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরটা রপ্ত করে নিলেন। অভিনয় ও পরিচালনা দুরকম কাজই করতে লাগলেন। তবু তাঁর মনে একটা সংশয় লেগেই রইল। তাঁর কেবলি মনে হয় গ্রাম্য জীবন ও গ্রাম্য সংস্কৃতিকে গণনাট্যের চোখ দিয়ে দেখলে ঠিকঠাক দেখা হয় না। ইতিমধ্যে মফঃস্বলে সিনেমা এসে গেছে। গ্রামের লোক সেসব দেখে শহুরে উচ্চারণ ও শহুরে সেন্টিমেন্টর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। কেবলমাত্র নিজেদের ভাষায় নিজেদের দুঃখকষ্টের গল্পটুকু আর তাদের পছন্দ নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হাত ধরে আধুনিক জগৎ তাদের জীবনযাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাচ্ছে। অনেক অজানা ভাবনা তাদের এখন আলোড়িত করে। একটা ছোট ঘটনার উদাহরণ শম্ভুমিত্র দিয়েছেন একবার কোন এক গ্রাম্য সমাবেশে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল ''রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি'' (সুপ্রভাত), এবং 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত'' (প্রশ্ন), এই কবিতা দুটিও। তিনি দেখলেন এর ফল হল অভাবিত। লোকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তা শুনলো। সভা শেষে এক গ্রামীন শিল্পি তাঁর সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেছিল - এ সব কবিতা কার লেখা? এ সব কথা এতদিন কেউ আমাদের বলেনি কেন? প্রশ্ন কবিতাটি যে তক্ষুনি লিখে নিল। এবং অনতিবিলম্বে মুখস্থও করে ফেলল।

এই সব ঘটনা ক্রমাগতই শম্ভু মিত্রকে গণনাট্যের জগৎ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তাঁর মনের মধ্যে বহুদিন থেকে যে আকাঙ্খাটি সুপ্ত ছিল, যে গভীর রসের নাটক করবেন, বিশ্বমানের নাটক করবেন, সে আকাঙ্খাও এখন ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে তিনি সেই কাঙ্খিত উৎকর্ষ দেখতে পাচ্ছিলেন। অথচ গণনাট্যই হোক বা সাধারণ রঙ্গালয়ই হোক রবীন্দ্রনাথে কেউই হাত দিতে চান না। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর কমেডিগুলি অবশ্য হয়। সেখানেও চিরকুমার সভা বা শেষরক্ষার নাট্যনির্দিষ্ট মার্জিত কৌতুকে সন্তুষ্ট না থেকে পরিচালকেরা নানারকম সস্তার ভাঁড়ামি ঢুকিয়ে দেন। এঁরা রবীন্দ্রনাথের তত্বনাট্য বা গভীর গম্ভীর নাটকগুলির দিকে তাকাবেন না (একমাত্র ব্যতিক্রম বিসর্জন) এটা বলাই বাহুল্য। এঁরা বলেন রবীন্দ্রনাটক অবাস্তব, অভিনয়ের অযোগ্য। অথচ এখন পরিণত মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়বার পর শম্ভু মিত্রের আদৌ সেগুলিকে অবাস্তব বা দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। হতে পারে তাদের কথোপকথনের ভাষা আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব, বা নাটকের স্থান কাল পাত্রপাত্রীরা কিয়দংশে ছায়াময়, কিন্তু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় চরিত্রগুলি প্রবল ভাবে জীবন্ত এবং বাস্তব। যে মর্মকথা নাটকে ব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের সমকালের দৈনন্দিন জীবনেরই সত্য কথা। কী করে অভিনয় করতে হয় এ সব নাটক? তাঁর ইচ্ছা হয় অভিনয় করে দেখান।

ইতিমধ্যে ভারত স্বাধীন হয়েছে। গণনাট্যের চরিত্রও বদলে যাচ্ছে। শম্ভু মিত্র নতুন দল খুললেন। নাম হল বহুরূপী (১৯৪৮)

— তিন —

বহুরূপীর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বমানের শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় করা। দেশী ও বিদেশী দুইই। তা তাঁরা করেওছিলেন। কিন্তু একেবারে প্রথমেই এটা করে ফেলা সম্ভব নয় বলে প্রথম কয়েকটি প্রয়াস গননাট্যসংঘের পুরনো ধারাতেই হয়েছিল যেমন, উলুখাগড়া, ছেঁড়া তার, পথিক প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক ততদিনে তিনি একটা অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু তা অন্য উদ্যোগের সঙ্গে, নিজের পরিচালনা বা নিজের নির্বাচনে নয়। নাটকটা হল মুক্তধারা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রস্মৃতি সাহিত্যিক সমিতি বলে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন একটা অভিনয় হোক, এবং তাঁরাই 'মুক্তধারা' কে বেছেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্রের মত গুনীজনেরা ছিলেন সেখানে। অভিনয় ভালই হল লোকে প্রশংসাও করেছিল, কিন্তু শম্ভু মিত্র নিজে সন্তুষ্ট হন নি। মুক্তধারা তাঁর আদৌ পছন্দের নাটক ছিল না। পরে বহুরূপী থেকেও এ নাটক হয়েছিল। তখনও তিনি সেভাবে

গুরুত্ব দেন নি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল এ ঠিক অভিনয়যোগ্য নাটক নয়। মুক্তধারার বক্তব্য খুব ভাল, যুগোপযোগীও বটে, কিন্তু সে বক্তব্য যে চরিত্রগুলির আশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে তারা অস্বাভাবিক এবং অতীকৃত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনটিও দৃঢ় নয়।

বহুরূপী থেকে প্রথম যে রবীন্দ্রনাটক করা হল তার নাম চার অধ্যায় (১৯৫১)। এই নাটকে শম্ভু মিত্র ও তাঁর দলবল মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। চার অধ্যায় ঠিক নাটক নয়, উপন্যাস, তবে আগাগোড়া সংলাপে গাঁথা উপন্যাস, মাঝে মাঝে যে বিবৃতি আছে তাকে মঞ্চনির্দেশ বলেও ভুল হয় না। ওই সময় বিশেষ করে চার অধ্যায়কে তাঁরা অভিনয়ের জন্য কেন বেছে নিলেন তার কতকগুলি বিশেষ কারন আছে। প্রথমত: বহুরূপী প্রতিষ্ঠার পর প্রথমদিকে কতগুলি গ্রামকেন্দ্রিক নাটক করার পর শহরজীবনের আখ্যানে বৈচিত্র্য আসবে এরকম তাঁদের মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, এবং সেটাই প্রধান কারণ, তাঁদের মনে হয়েছিল বাঙালী জীবনে সন্ত্রাসবাদের ধরনের একটা আত্মঘাতী প্রবণতা কোথায় যেন লুকিয়ে আছে; এবং সমাজের অংশবিশেষে সেটা বারে বারেই ফিরে ফিরে আসে। সে বিষয়ে চার অধ্যায় খুব ভালো রচনা। তৃতীয়ত- বাজারচলতি সব নাটকেই জীবনের বাইরের দিকের সমস্যাগুলোই বেশি করে দেখানো হয়। মানবপ্রকৃতির গভীরে ঢোকার চেষ্টা বিশেষ নেই। চার অধ্যায়ের জীবনসমস্যা অন্তর্মুখী। এইসব নানা কারণে সেদিন চার অধ্যায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।

অদ্ভুত এই নাটকের জগৎ। চরিত্রসংখ্যা এখানে অল্প। এরা একটা ছোট সময়সীমায় বাঁধা। তীব্র টেনশন রয়েছে তাদের জীবনে। তাই তাদের কথা ও কাজ খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা হয়েছে। তারা অনর্গল কথা বলে। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর লোক একই ভাষায় কথা বলে। এবং সকলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে। এই নাটককে পরিচালক বাস্তব সম্মত করবেন কিভাবে ? শম্ভু মিত্র সমস্যাটার মুখোমুখি হলেন ভিন্ন এক দৃষ্টিকোন থেকে। ধরা যাক কোনো মানুষ একটা ঘোর আত্মিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। তার মনের মধ্যে ঘটছে তুমুল আলোড়ন। ভূমিকম্পে যেমন করে ধ্বংস হয়ে যায় বড় বড় প্রাসাদ তেমনি করে তার বিশ্বাসগুলি ভেঙে যাচ্ছে। দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে এইসময় তার মুখের ভাষা কি হবে? আদৌ কোনো ভাষা থাকবে কি? যদি থাকেও তা কি হবে না অসম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও খন্ডিত? তার শরীরী ভাষা কি সুন্দর হবে? নাকি তা হবে বিকৃত ও অসুন্দর? অস্ত্র হাতে যে লোক শত্রুকে খুন করতে চলেছে, যার মনের মধ্যে আগুনের মত জ্বলছে প্রতিশোধস্পৃহা, সে কি সেই অবস্থায় উদ্যত তলোয়ার হাতে অন্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে বিষন্ন সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে পাতার পর পাতা কবিতা আবৃত্তি করবে? আমাদের বাস্তব বুদ্ধি বলে অবশ্যই তা করবে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে শেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথ হ্যামলেটেরা ঠিক ঐ কাজই করেছিল এবং সেই সব অবিস্মরনীয় স্বগতোক্তি যুগ যুগ ধরে লোকের প্রশংসা পাচ্ছে। তাহলে অতীন এলা কি দোষ করল? অতীনের মত মহৎপ্রাণ গভীর মনের যুবক, যাকে আর কিছুক্ষণ পরেই মারতে ও মরতে হবে, সে যদি এই প্রত্যাসন্ন মূহূর্তের আলোয় তার প্রেমিকাকে উদ্ভাসিত করে দেখে এবং বলে ওঠে 'প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস/ তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ", তাহলে ভুল কোথায়? আসলে এ সব ভাষা বহির্জগতের কথোপকথনের ভাষা নয় ঠিকই, কিন্তু অন্তর্জগতের অব্যক্ত ভাষা তাতে সন্দেহ নেই। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মনের মধ্যে এই কথাগুলি ছিল। কথারূপে ছিল, অন্তশ্চৈতন্যে ছিল। আবার যে দর্শক বা পাঠক তাদের নিরীক্ষণ করছে তাদের মনের মধ্যেও অনুরূপ ভাবনা রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য কবিতার। যেখানে মনের নিহিত নিগূঢ় অনুভূতিগুলিকে বাইরে টেনে আনা হয়। আবৃত্তি করবার সময় বিশেষ বিশেষ শব্দ বা বাক্যাংশের ওপর আলাদা সুরের সঞ্চার করতে হয়। চার অধ্যায়ে সংলাপের সেই কাব্যগুনটি শম্ভু মিত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এবং তদনুযায়ী সংলাপবাচনে আবৃত্তিধর্মিতা এনেছিলেন। অভিনয় সফল হয়েছিল।

১৯৫১ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় ত্রিশ বছর ধরে বহুরূপী অনেকবার এই নাটক অভিনয় করেছে। আশ্চর্য এই যে নায়ক নায়িকার কোনো পরিবর্তন হয় নি। সেই এক শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্র নায়ক নায়িকা সেজেছেন। প্রৌঢ় নরনারী আঠাশ বছরের প্রেমিকযুগলের অভিনয় করেছে এটা কারও বেমানান লাগেনি। বরং শেষের দিকে নকশাল যুগের আবহাওয়ার যে সব দিন চার অধ্যায়ের শো থাকত, সে সব দিন প্রেক্ষাগৃহ ভরে যেত খুব তাড়াতাড়ি। হয়ত দর্শকেরা এই গল্পের মধ্যে অন্যভাবে তাঁদের সমসাময়িক জীবনটা দেখতে পেতেন। শাঁওলি মিত্রের স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারি এ নাটকে শম্ভু মিত্র প্রধানত জোর দিতেন কুশীলবদের শরীরী ভাষা ও বাচিক অভিনয়ের দিকে। এটি ক্রিয়াপ্রধান নাটক নয়। ক্রিয়ার বেশীর ভাগই ঘটেছে নেপথ্যে। মঞ্চসজ্জা দিয়েও কিছু বোঝাবার ছিল না। তাই মঞ্চসজ্জা হত সরল ও বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু আবহের কিছু ভূমিকা ছিল। সেখানে কখনো কখনো বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠতো জিগিরের মতো করে। কখনো শোনা যেত ঝড়ের শব্দ, কখনো অন্ধকার রাতে দূর থেকে কুকুরের ডাক কিংবা গির্জার ঘন্টার শব্দ। তার সঙ্গে বিপদসংকেতের হুইশ্‌ল্ মিলেমিশে যেত। এই সব দিয়েই শম্ভু মিত্র চার অধ্যায় নাটকটি সাজিয়েছিলেন।

চার অধ্যায়ের পরে বহুরূপী মঞ্চস্থ করেছিল রক্তকরবী। কিন্তু রক্ত করবীর কথা আপাতত স্থগিত রেখে প্রথমে বলে নিই রাজা নাটকের ইতিহাস। সেটা বহুরূপীর স্বর্ণযুগ। অল্প আগেই তাঁরা মঞ্চস্থ করেছেন সোফোক্লেসের রাজা অয়দিপাউস। সেখানে সংঘাত আছে, উদ্বেগ আছে, উত্তেজনা আছে। পশ্চিমি নাটকে প্রবল হৃদয়বেগের যে উথালপাথাল থাকে ঐ নাটক ছিল সেই সব উপাদানে ভরপূর। তার পরেই যখন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রাজা নামালেন তখন অনেক লোক বলতে লাগল এ কীরকম নাটক? সে যুগের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শম্ভু মিত্র বলেছেন যে এরকম কথা যাঁরা বলতেন তাঁর বেশিরভাগই ছিলেন বিশেষজ্ঞ পন্ডিত লোক। কিন্তু সাধারণ দর্শক, যারা নাট্যতত্ব জানেন না, হয়ত তত বেশি শিক্ষিতও নন, তাঁরা কোনো অভাববোধ করতেন না। কেন এরকম বিপরীত প্রতিক্রিয়া? শম্ভু মিত্রের মতে রাজা যাঁদের অস্বস্তিতে ফেলত সেই বিশেষজ্ঞদের বিচারবুদ্ধি গঠিত হয়েছে পাশ্চাত্য নাট্যচর্চা থেকে। তাঁরা নাটক সম্বন্ধে একটা পূর্বসংস্কার নিয়ে অভিনয় দেখতে যেতেন এবং হতাশ হতেন। অপর পক্ষে সাধারণ লোক, যাঁরা যাত্রা দেখেন। কথকথা শোনেন আবার সাধারণ রঙ্গালয়ের থিয়েটারেও যান তাঁদের কোনো পূর্বসংস্কার ছিল না। বরং আমাদের পুরনো দেশজ নাট্যসংস্কারগুলির শিকড় তখনও তাঁদের অন্তশ্চৈতন্যে রয়ে গিয়েছিল। রাজা নাটকের নিস্তরঙ্গ জগৎ সেইজন্য তাঁদের উপভোগের বাধা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের তত্বনাট্যে আমাদের দেশজ রীতিনীতির আধুনিক প্রয়োগ শম্ভু মিত্রের একটা বড় আবিষ্কার। এই ধরনের একটা কথা তিনি প্রথম শুনেছিলেন শিশির ভাদুড়ির কাছে। শিশিরবাবু তাঁকে বলেছিলেন আমাদের নাট্যশিল্পের উন্নতি চাইলে যাত্রার কাছে তাকে হাত পাততে হবে। তখন শোনবার সময় কথাটার অর্থ তিনি বোঝেন নি, বরং ভেবেছিলেন গ্রামের যাত্রা যখন আজকাল শহুরে থিয়েটারের অনুসরণ করছে তখন তার কাছে আর নতুন করে শেখবার কী আছে। এ ঘটনার অনেক পরে, বহুরূপী তখন চালু হয়ে গেছে, নাটকের প্রয়োগপরীক্ষা নিয়ে দেশ বিদেশের বহু বই তিনি পড়ে ফেলেছেন, সেই সময় বিষ্ণু দের একটা কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। বিষ্ণু দের বক্তব্য ছিল আমাদের দেশের শিল্পাচিন্তায় প্রতীক ব্যবহারের একটা সহজাত প্রবণতা আছে। তিনি বলেছিলেন বাঁকুড়ার ঘোড়া তো বাস্তব ঘোড়া নয়; কিন্তু সেটা গড়েছে একেবারে গ্রামীন শিল্পী; আর ওর মধ্যে আপামর জনসাধারণ যুগ যুগ ধরে আসল ঘোড়াটাকেই দেখতে পাচ্ছে। শম্ভু মিত্রের মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাটক অভিনয়ে অনেকটাই দর্শকের কল্পনার ওপর

ছেড়ে রাখতে চান। কোনোরকম দৃশ্যপট ব্যবহারের তিনি বিরোধী। সংস্কৃত নাটকের উদাহরণ তিনি বহুবার দিয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রথম দৃশ্যে রথারোহী রাজার দ্বারা এক মৃগের পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্য আছে। কালিদাসের কালে এ নাটকের অভিনয়ে রাজা কিন্তু রথে চেপে রঙ্গভূমিতে ঢুকতেন না। জীবিত বা মৃত কোনো মৃগ ত্রিসীমানায় থাকত না। পরিষ্কার বলা আছে যে নটেরা রথবেগ অভিনয় করে দেখাতেন— রথবেগং নটয়তি। সে ঐতিহ্য তার গৌরব হারিয়ে স্থূল রূপে গ্রাম্য যাত্রা পালায় টিঁকে ছিল মাত্র। এদিকে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর শহর কলকাতায় ইংরেজের হাত ধরে আমাদের নাট্যকলার পুনরুজ্জীবন ঘটল। এ ঐতিহ্যও ফেলে দেবার নয়, বরং শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এর চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আমরা যেন না ভুলি যে অন্যরকম নাট্যকলাও হয়, এবং তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন আমাদের দেশেই ছিল। এখনো বাস্তবের সঙ্গে প্রতীকের যোগাযোগে ভারতীয় মন সহজেই সাড়া দেয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে এইজন্যে প্রতি নাটকে এত নাচগান। সেখানে সেট ও সিন দিয়ে সাজানো বাস্তব মঞ্চে হঠাৎ কর্ণের সামনে নিয়তি এসে কেঁদে কেঁদে গান গায়। নাদির শাহের সামনে আলুলায়িতকুন্তলা ভারতমাতা এসে অভিশাপ দিয়ে যায়। লোকে এসব পছন্দই করে।

দেশীয় ঐতিহ্যের এগুলি হল প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য। ভাবগত বৈশিষ্ট্যও তার আলাদা রকম হত। পাশ্চাত্য নাটকের প্রধান লক্ষণ হল গতি, সংঘাত, চমৎকারিত্ব, দ্বন্দ্বই তার প্রাণ। অপর পক্ষে সংস্কৃত নাটকের ধর্মই ছিল সত্বগুনের উদ্রেকের দ্বারা রসোদ্বোধ। তাকে বলা হত দৃশ্যকাব্য। ক্রিয়া ও আবেগের প্রবলতা সেখানে পরিহার করা হত। দূরাহ্বান, বধ, নৃশংশতা, বিয়োগান্ত পরিণতি প্রভৃতি সেখানে নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে থাকত মন্থরগতি শ্লোক। সেই সব দৃশ্যকাব্যের কবিরা জীবনের দুঃখবেদনা সম্পন্ধে অচেতন ছিলেন না। কিন্তু তার প্রকাশটা ছিল শান্ত অনুগ্র। এইভাবে সংস্কৃত নাট্যকলায় একধরনের সুকুমার কাব্যনুভূতি নাট্যদেহে লগ্ন হয়ে থাকত।

শম্ভু মিত্রের বিচারে রবীন্দ্রনাথের রাজা ঠিক এই ধরনের নাটক। এখানে কোনো সংঘাত নেই, একটি উত্তরনের ইতিহাস আছে মাত্র। একজন মানুষের আত্মোপলব্ধির দুরূহ যাত্রা কেমন করে সার্থক হল তা বোঝাবার জন্য যেন আমাদের অনুভূতির উৎসমুখগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই নাটক প্রযোজনার সময় শম্ভু মিত্র কোনো চিত্রিত দৃশ্যপট ব্যবহার করতেন না। মঞ্চে আসবাব রেখেছিলেন যথাসম্ভব কম। এখন স্টেজে বাড়তি জিনিসপত্র থাকলে অভিনেতাদের কিছু সুবিধা হয়। তাঁরা বাচিক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কায়িক অভিনয়েও বৈচিত্র্য আনতে পারেন। শূন্য স্টেজে সমস্তটা নির্ভর করে অভিনেতার দেহভঙ্গীর ওপর। যেমন নৃত্যনাট্যে হয়ে থাকে। রাজার প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র এই কৌশলটা নিয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথ আগেই নিয়েছিলেন শাপমোচন নৃত্যনাট্য করে)। স্টেজের শূন্যতাটাকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহভঙ্গীর বৈচিত্র্যে। পিছনে অন্ধকার, দুপাশে শূন্যতা, মধ্যে অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর, ও সংগীত দিয়ে মূর্ত করেছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সুদর্শনার যাত্রা।

রাজা শম্ভু মিত্রের প্রিয় নাটকগুলির একটি। সেই উত্তরপ্রদেশে থাকার সময় থেকেই এ বই তিনি নিজে বার বার পড়েছেন, অন্যকেও পড়িয়েছেন, পড়ে শুনিয়েছেন, এ নাটক কেন তাঁকে এত আকৃষ্ট করেছিল বলা কঠিন। এখানে সে অর্থে কোনো নাটকীয়তা নেই। চার অধ্যায় বা রক্তকরবীয় মত কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সমস্যার কথা নেই। এ নাটক আধ্যাত্মিক বা আত্মিক। তবে বাস্তবতা দিয়ে বিচার করলে এ নাটকের দ্বৈত রূপ আছে - যা একাধারে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের এক উত্তরণ, এবং অপরদিকে দেশকালনিরপেক্ষভাবে যে কোনো মানুষেরও বটে।

রাজা (১৯৯০) লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনের একটা সংকটের কালে। ঐ একই বছরে বেরিয়েছিল গীতাঞ্জলি। দু বছর পর ডাকঘর। তাঁর অন্তরে এগুলির সূচনা নিশ্চয় আরও কিছুদিন আগেকার। ঠিক ঐ সময়টায় তিনি চরম দুঃখ ও বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিলাইদহের বাস উঠিয়ে তিনি যখন সপরিবারে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন (১৯৯০) তখন ইচ্ছা ছিল বালকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে অন্যভাবে জীবন যাপন করবেন। ভেবেছিলেন এবারকার নতুন অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর সামনে আত্মোপলব্ধির নব নব দিগন্ত খুলে দেবে। তা দিয়েছিল ঠিকই। তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভেবেছিলেন আদৌ সেভাবে নয়। শান্তিনিকেতনে সর্বস্ব ব্যয় করে তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তার পরের বছরই মারা গেলেন মৃণালিনী দেবী। এ বছরেই কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হল তাঁর দ্বিতীয় সন্তান রেনুকার। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পিতা, কনিষ্ঠ পুত্র, বিদ্যালয়চালনায় সহায়স্বরূপ সতীশচন্দ্র এঁরাও মারা গেলেন। বিচ্ছেদ হল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে। শোকের অবকাশটুকুও তাঁর ছিল না, কারণ চারদিক থেকে ঘনিয়ে এসেছিল নানা বিপদ- অর্থাভাব, অসহযোগিতা, দেশবাসীর পরিব্যাপ্ত ঈর্ষা ও কুৎসা। ভাগ্যের প্রহারে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চিরকালের বজ্রকঠিন স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল। তখন কি তাঁর মনে অন্তরতম জীবনদেবতার অভিপ্রায় নিয়ে কোনো প্রশ্ন জাগেনি? তিনি তো মানুষই ছিলেন, দেবতা তো নন ? খেয়া কাব্যগ্রন্থের বিষাদাচ্ছন্ন থমথমে আকাশ কি যথেষ্ট ইঙ্গিতবাহী নয়? সুদর্শনার মতো তাঁরও কি কখনও আপন ঈশ্বরকে বলতে ইচ্ছা হয় নি ''কালো'' কালো, তুমি কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, ঝড়ের মেঘের মতো কালো।'' তারপর আস্তে আস্তে বিক্ষোভ শান্ত হয়েছে। বিধাতায় অভিপ্রায় তিনি মেনে নিয়েছেন। অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত এক আলোয় শান্ত হয়েছে তাঁর অচলপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রসদৃশ হৃদয়। রাজা নাটকের ঠাকুরদার পাঁচটা ছেলেই মরে গিয়েছিল। লোকে তাকে বলত রাজাকে তুমি বন্ধু বল এর পরেও? তোমার রাগ হয় না? ''উত্তরে ঠাকুরদা বলেছিল ''ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব? এমনি বোকা?'' সুদর্শনা বোকা ছিল। সে ভেবেছিল রাজার ওপর তার বিশেষ রকম দাবী আছে। সে যে রাজার নির্বাচিত আদরিনী রানী। সে মনে করত রাজা সুন্দর। শুধুই সুন্দর। রাজা তার সুখের ঘরে আগুন লাগিয়ে, অপমানে আঘাতে জর্জরিত করে, পথের ধুলায় টেনে নামিয়ে তার ভুল ভাঙালেন। তার রানীগিরি গেল, সকল অহংকার ডুবে গেল চোখের জলে। তবেই সে বুঝল রাজা সুন্দর অসুন্দরের অতীত। তার প্রেমে আঘাত আছে, কিন্তু অবহেলা নেই।

বহুরূপীর সবচেয়ে পরিশ্রমী প্রযোজনা হল রক্তকরবী। এই নাটক নিয়ে যত শোরগোল হয়েছিল এমন আর কোনো নাটক নিয়ে হয় নি। এর অপব্যাখ্যা হয়েছিল প্রচুর। কোনো কোনো পণ্ডিত লোক শম্ভু মিত্রকে এমনও বলেছিলেন যে তাঁরা মূল নাটকের কোনো কথা আদল বদল না করেও এমন সুকৌশলে অভিনয়টা সাজিয়েছেন যে গুরুদেবের রচনার মর্মই গেছে বদলে। অনেকে আবার এ নাটকে তদানীন্তন নেহেরু সরকারের সমালোচনা দেখেছিলেন, কেউ বা বার বার লাল রঙের উল্লেখ দেখে ধরে নিয়েছিলেন এটা কমিউনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা। এত রকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারনেই হোক শম্ভু মিত্র পরবর্তীকালে রক্তকরবী প্রযোজনা নিয়ে ছোটবড় অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে সুবিধা হয়েছে আমাদের যারা রক্তকরবী অভিনয় দেখিনি। ঐ লেখা থেকে প্রকরণগত খুঁটিনাটির কথা যেমন জানতে পেরেছি, তেমনই বহুরূপীর দৃষ্টিকোনটিও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রক্তকরবীর জগৎ বিশাল ও জটিল। যক্ষপুরী কোন একটি খনিশহর বা শিল্পনগর নয়। কোনো একটা দেশ বা শাসনপ্রনালী নয়। অর্থনীতি রাজনীতির তত্ব নয়। এটা মানবসভ্যতার একটা বিশেষ অবস্থার কথা। এ অবস্থা বহুস্তরবিশিষ্ট এবং সমসাময়িক। এই অবস্থার মধ্যেই আমরা আছি। নানা কাজে নানা মানুষ এখানে ঘোরাফেরা করছে। তাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য অশেষ আপাতদৃষ্টিতে এরা সবাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলে বটে, কিন্তু একটু মন দিয়ে শুনলে বোঝা যায় প্রত্যেকের ভঙ্গী আলাদা। যে ভঙ্গীতে চন্দ্রা তার

'সর্দারদাদা'র কাছে ছুটির আবেদন করে তা গ্রাম্য চাষালোকেরই কথার ভঙ্গী। গোকুল ও ফাগুলাল দুজনেই খোদাইকর কিন্তু শান্তশিষ্ট ফাগুলাল আর রগচটা গোকুলের তফাত মুখ খুললেই বোঝা যায়। আর মেজো সর্দার যখন বড় সর্দারকে বলে ''নাচওয়ালি আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম '' আর বড় সর্দার বলে ''এবার কিন্তু ঐ মেয়েটাকে (নন্দিনীকে) অবিলম্বে''— সে কথা শেষ করে না; আর তখন মেজো সর্দার, যার মধ্যে হয়ত বা কিছু মনুষ্যত্ব এখনো অবশিষ্ট আছে, কেমন শিউরে উঠে বলে ''না না ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়''। তখন ঐ সব লোকগুলি কি আশ্চর্যভাবেই না জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই সব সর্দার, মোড়ল, গোঁসাইয়ের দল অহরহ আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা টের পাই। এখানকার অসংখ্য নরনারীদের একদলকে নাম দেওয়া হয়েছে যেমন, নন্দিনী, বিশু, চন্দ্রা ফাগুলাল, গোকুল, গজ্জু, কিশোর, রঞ্জন প্রভৃতি। আবার অনেকের রয়েছে শ্রেনীনাম যেমন, রাজা, সর্দার, অধ্যাপক, পুরানবাগীশ, গোঁসাই, মোড়ল ইত্যাদি। সকলেই এমন নিবিড়ভাবে মিলেমিশে আছে যে দু দলকে আলাদা করা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, সব চরিত্রের মধ্যেই একটা দ্বিমাত্রিকতা আছে। কিশোর যখন মঞ্চে ঢোকে তখন সে কিশোর নামের এক বালক। আবার তার মধ্যেই ব্যক্ত হয় চিরন্তন কৈশোরের স্বভাব। প্রত্যেকেই তাই। আর এই দ্বৈত রূপের জন্যই নাটকটি কোনো একটা বিশেষ স্থানকালের সীমায় বাঁধা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নাটকের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন এটা আমরা খুব বেশি দেখি নি। কিন্তু রক্তকরবীর ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন - ইংরিজি এবং বাংলা দু ভাষাতেই। তিনি বলেছেন এ নাটক ''সত্যমূলক''। যক্ষপুরী মাটির তলায় নেই। ওপরেই আছে। পথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে এই যক্ষপুরী তৈরি হতে পারে। যক্ষপুরী গড়ে ওঠে রাজার শক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত শম্ভু মিত্র এভাবে ব্যাখা করেছেন যে, এই রাজা হল মানুষের আবিষ্কৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বুদ্ধি ও বাহুবল। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উদ্যম ও সাহসের সঙ্গে সে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে শক্তি ও সম্পদ আহরণ করে এনে গড়ে তুলেছে আধুনিক সভ্যতার অভ্রংলিহ প্রাসাদ। শক্তিবাহুল্যের যোগে সামান্য মানুষ হয়ে গেছে একদেহে বহু মানুষের সমান। বাল্মীকির রাবণের দশ মুন্ড কুড়ি হাত ছিল। বিজ্ঞানের ব্যবহারে আধুনিক মানুষের তার বেশি আছে। কিন্তু এই সভ্যতার ভিতরে কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। সেই ভুলের জন্য তার ভারসাম্য বজায় থাকে নি। যে বিদ্যার ব্যবহার সর্বমানবের কল্যাণে হওয়া উচিত ছিল তা দখল করে নিয়েছে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী। বিজ্ঞানরূপী রাজাকে তার জালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে তার নামে যক্ষপুরী শাসন করে। তাদের ভণ্ডামির নীতি খুব স্পষ্ট - ''রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, ঠেকাতেও হয়।'' শক্তিবিভোর স্বেচ্ছান্ধ রাজাটা এসব বুঝতে পারে না (একেবারে শেষে বুঝেছিল)। সে গর্বভরে বলে ''সৃষ্টিকর্তার চাতুরি আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই। —আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব।'' রবীন্দ্রনাথ এ সভ্যতাকে বলেছেন আকর্ষণজীবী সভ্যতা। কর্ষণ (পুনরুৎপাদন) এখানকার নিয়ম নয়। আকর্ষণই (শোষণ) এখানকার রীতি। শুধু মাটির তলা থেকে সোনা তুলে আনাতেই এ আকর্ষণ শেষ হয় না। এ সভ্যতা কেড়ে নেয় মানুষের শক্তি (রাজার এঁটো)। মানুষের বুদ্ধি (চন্দ্রা, গোকুল)। বিবেকবোধ (মেজ সর্দার), মনুষ্যত্ব (যা বিশু হারাতে বসেছিল), সাহস (গজ্জু) তারুণ্য (কিশোর) ও যৌবন (রঞ্জন)। সারা দেশে ছড়ানো থাকে গুপ্তচরবৃত্তির জাল (গোঁসাই, মোড়ল)। কঠোরভাবে দমন করা হয় প্রতিবাদ শুধু নয়, প্রতিবাদের সম্ভাবনাকেও (সর্দার ও সৈন্যদল)। রাজা এই ব্যবস্থা তৈরি করে নি। ঘটনাচক্রে অজ্ঞাতসারে সে তার অংশ হয়ে গিয়েছিল। রাজা যে দিন প্রকৃত অবস্থা বুঝেছে, তৎক্ষণাৎ সে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। ভেঙে ফেলেছে দন্ড, ছিঁড়ে ফেলেছে কেতন। নন্দিনীর হাতে হাত রেখে প্রার্থনা করেছে শান্তি। চলে গেছে নবজন্মের পথে। অপর দিকে যক্ষপুরীতে ঠিক যা যা নেই রঞ্জন ও নন্দিনী যেন তারই প্রতীক। যৌবন, প্রান, প্রেম, আনন্দ সরলতা সৌন্দর্যবোধ, বেঁচে থাকার সুখ। রঞ্জন এক প্রাণময় তরুন প্রেমিক। আর সে রাজার অন্তরস্থ প্রানপুরুষও বটে। সে না থাকলে রাজা আর রাজা হতেই পারতো না। তাই তার মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে রাজা হাহাকার করে বলে ওঠে ''আমি যৌবনকে মেরেছি — এতদিন ধরে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে যৌবনকে মেরেছি''। এইভাবে রঞ্জন ও নন্দিনী তাদের দ্বৈতসত্তা নিয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে। যে নন্দিনী ''প্রাণের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক' সেই আবার ধানি রক্তের কাপড় পরা রক্তকরবীর ভূষণ পরা, প্রানময়ী, সরলা একটি গ্রামের মেয়ে। প্রাণ অবিনশ্বর, যৌবনও তাই। সেইজন্য রঞ্জন, যাকে কেউ ধরে বেঁধে রাখতে পারে নি, বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও যে হাওয়ার মত মিলিয়ে গিয়ে বেরিয়ে আসে, এবং গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে চলে যায়, সে রাজার ঘরে গিয়ে ধরা দিলই বা কেন, আর রাজা তাকে অনায়াসে মেরে ফেললই বা কী করে, আর প্রাণের নন্দিন তার মৃতদেহের সামনেই হত্যাকারীর হাতে হাত রেখে চলে গেল অস্তগোধূলির রাঙা পথটি ধরে। এটা কি করে সম্ভব হয় যদি না নন্দিনীর মত আমরাও বিশ্বাস করি ''রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না।''

রক্তকরবীর এইরকম ব্যাখ্যাই করেছেন শম্ভু মিত্র। তাঁর দাবি তিনি এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁকে অতিক্রম করেন নি। এই নাটকের দিকে তাঁর নজর ছিল অনেক আগে থেকেই কিন্তু বহুরূপী স্থাপন করেও তিনি সদ্য সদ্য এতে হাত দিতে চান নি। তাঁর মনে সন্দেহ ছিল তিনি এই নাটকের বিভিন্ন স্তরগুলিকে যথাযথ ফোটাতে পারবেন কি না। তারপর এক সময় খালেদ চৌধুরী এসে বহুরূপীতে যোগ দিলেন। নাট্যপ্রযোজনার আঙ্গিকগত দিকগুলিতে খালেদ চৌধুরীর অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি আসায় শম্ভু মিত্র সাহস পেলেন এবং রক্তকরবীর মহলা শুরু হল।

মহলা দিতে দিতে এখানে অদ্ভুত কিছু কিছু নাট্যকৌশল তাঁরা লক্ষ্য করলেন। এ ধরনের কৌশল ইতিপূর্বে কোনো বাংলা নাটকে তাঁরা দেখেন নি। প্রথম প্রশ্ন রক্তকরবীর ঘটনাসংস্থান নিয়ে, অর্থাৎ ঘটনাগুলি কোথায় ঘটছে এবং কখন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। আপাতদৃষ্টিতে এই নাট্যে একটিই দৃশ্য, রাজার জালায়তনের সামনের পথ। কোনও দৃশ্যান্তর নেই। বিরতিও নেই। পর্দা উঠলে দেখা যায় সেই পথের ধারে একটি চাতালে বসে নন্দিনী মালা গাঁথছে। সেখানেই কিশোর প্রবেশ করে তার মনের কথা বলে চলে যায়। তারপর ওখানেই যাওয়া আসা করে গোকুল অধ্যাপক প্রভৃতি নানা লোকজন। তারপর ওখানেই রাজার জালের দরজায় ঘা দিয়ে নন্দিনী রাজাকে ডাকে এবং উভয়ের দীর্ঘ কথোপকথন চলে। সারা নাটকে রাজার সঙ্গে এরকম সংলাপ তিনবার আছে। দুজনের মধ্যে যে ধরনের কথাবার্তা হয় তা হাটের মাঝখানে বসে বলবার কথা নয়। তার জন্য নিভৃতি দরকার। আর সত্যি সত্যিই রাজা ও নন্দিনীর দীর্ঘ সংলাপদৃশ্যের মধ্যে ঐ রাজপথ দিয়ে কোনো পথিক যায়না। জগৎসংসার যেন স্তব্ধ হয়ে থাকে। দূর থেকে শুধু ক্বচিৎ শোনা যায় ফসল কাটার গান পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। এরপর সেই অলৌকিক মূহূর্ত পার হলেই সেখানে ঢুকে পড়ে ফাগুলাল ও চন্দ্রা। যেভাবে তারা মদের বোতল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে তাতে এমন ধারনাই সঙ্গত যে এটা তাদের নিজেদের ঘরের আঙিনা। এইরকম ঘটেছে সারা নাটক জুড়ে। এতরকমের বৈচিত্র্য একটা দৃশ্যে হতে পারে না। আমরা বুঝতে পারি এটা অনেক দিনের অনেক দৃশ্যের খণ্ড নিয়ে তৈরি একটা কোলাজ।

সময় নিয়েও সেই একই বিভ্রান্তি ঘটে। নাট্যসূচনায় যখন কিশোর ঢোকে এবং নন্দিনী তাকে কাজে যেতে উপদেশ দেয় তাতে মনে হয় এটা কোনও কাজের দিনের সকালবেলা। একটু পরেই ফাগুলাল ও চন্দ্রার কথায় জানতে পারি আজ ছুটির দিন। ধ্বজাপূজার

উল্লেখে, রাজারক অবসাদ ঘোচাবার সংকল্পে, এবং সর্দারদের নাচওয়ালি দের নিয়ে উত্তেজিত প্রস্তুতিতে অনুমান হয় আজ কোনো একটা বড়সড় উৎসব হতে চলেছে। রাজার এঁটোরা যখন সুড়ঙ্গ থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসে তখন স্পষ্টতই তা কাজে দিনের বিকেল। আবার শেষকালে, বলাই হয়েছে গোধুলির রঙে আকাশ রাঙা হয়ে উঠল। আমরা বুঝতে পারি এ নাটকে অনেক দিনের নানা সময়ের কথাই বলা হয়েছে। পথে, আঙিনায়, ঘরে, গোপন মন্ত্রনাকক্ষে অনেক সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত্রি জুড়ে ঘটনাগুলো ঘটেছে। কোনো দৃশ্যপট বদল হয় নি। এই কৌশল আমাদের দেশজ যাত্রাপালার কৌশল।

রক্তকরবী যখন লেখা হয় (১৯২৫) তখনও আমাদের মঞ্চসজ্জা হত সম্পূর্ণ বিলিতি রীতিতে সেট ও সিন দিয়ে। আর যাত্রা হত চারদিক খোলা মঞ্চে। রক্তকরবীর মঞ্চ কিন্তু চারদিক খোলা যত্রামঞ্চ নয়। রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকেই তা নয়। তদুপরি এ মঞ্চ নিরাভরণও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশজ রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে যুগোপযোগী আকার দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ রেখেই বহুরূপী তাঁদের মঞ্চটি সাজিয়েছিলেন। দায়িত্বে ছিলেন খালেদ চৌধুরী। মঞ্চসজ্জার প্রাথমিক পরিকল্পনাটা তাঁরা পেয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি থেকে। ছোটো ছোটো ঐ সাদাকালো ছবিগুলি ছিল অসম্ভব জোরালো। তাদের মধ্যে ছিল জালায়তনের একটা নক্শা আর ছিল অন্ধকারের মধ্যে নেমে যাওয়া একটি সিঁড়ির আভাস। বহুরূপীর অভিনয়ে পিছনে জালায়তন রইল। সিঁড়িও রইল। তার সঙ্গে তাঁরা স্টেজটি ভরে দিলেন ছোট বড় উচ্চতার কতকগুলি চাতাল দিয়ে। তার সঙ্গে জ্যামিতিক নক্শার ছোট বড় নানা কম্পোজিশন দিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলি ভরিয়ে দিলেন। এই কম্পোজিশনগুলি বহুস্তরবিশিষ্ট সমাজের প্রতীকরূপে দাঁড়িয়ে রইল। আজকের গ্রুপ থিয়েটারে প্রতীকী মঞ্চসজ্জা আর নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেদিন এটা ছিল একেবারেই অভিনব।

রক্তকরবীর সঙ্গীত প্রয়োগেও বৈচিত্র্য ছিল। এ ধরনের নাটকে সুরের একটা বড় ভূমিকা থাকে। কিন্তু আবহসঙ্গীতের যে রীতিটা তখনকার দিনের নাটকে প্রচলিত ছিল তা রক্তকরবীর পক্ষে উপযুক্ত হত না। আবার কারখানা বা খনির বাস্তব যন্ত্রশব্দ দিলেও তাতে কাজ হবে না। যক্ষপুরীর ভাবজগৎকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সুর ও অসুর দুইই চাই। এ সমস্যার সমাধান করবার জন্য তাঁরা নিজেরাই কতকগুলি যন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। কাঠের টুকরোর মধ্যে ভেতরটা কুরে কুরে সেখানে ধাতুর পাত ঢুকিয়ে তাঁরা তৈরি করেছিলেন কাট্টকুটুম। ব্যাঞ্জোর খোলে দোতারা তৈরি করে নাম হল ব্যান্-তারা। মোটা লোহার শেকল টেনে টেনে বিচিত্র আওয়াজ করা এক বস্তু তৈরি হল। তার নাম ঘড়ঘড়ি। প্রচলিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল বাঁশি ও বেহালা। তার সঙ্গে ছিল ঝাঁঝ ও নাকাড়া। সংকটমুহূর্তে আবহাওয়া তৈরির জন্য এ সবই বাজত। কেমন করে তাঁরা আলো, রং, ধ্বনি, ও কথাকে মেলাতেন তার একটা ছোট বিবরন বরং শম্ভু মিত্রের নিজের কথাতেই শোনা যাক। —"রক্তকরবীর মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা জাগানো দৃশ্য আছে। যখন অন্ধকার মঞ্চে ধীরে ধীরে একটা লাল মেঘের ছায়া ভেসে ওঠে। তখন একটা সুর বাজে নাকাড়ার গম্ভীর বিলম্বিত তালের সঙ্গে। দু টি বাঁশি (একই লোকের হাতে) খালেদ চৌধুরীর নিজের হাতে বেহালা। আর একজন একটা ঝাঁঝি নিয়ে। এই সুরেরই পরিবেশে বিভ্রান্ত নন্দিনী প্রবেশ করে। এই সময়টুকুতে যে সুর সৃষ্টি হয় তাতে জানা বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হয়। অতি অল্প শব্দের মধ্যে বাজনাগুলো বাজে ছেড়ে ছেড়ে। নাকাড়ার গুম গুম শব্দ বিলম্বিত তালটা রাখে। আর নিস্তব্ধ মূহূর্তগুলো বাজনার অংশ হয়ে ওঠে। একটা জটিল অনুভব তৈরি হয় শ্রোতাদের মনে। অতি অল্প যন্ত্র, অতি অল্প শব্দ, কয়েকটা সাঙ্গীতিক Phrase। তাতেই যেন নৈ:শব্দ শব্দের অঙ্গীভূত হয়। মনে হয় কী যেন একটা হতে চলেছে। এবং সে অনুভবটাও জটিল। —আবার যখন নৈবেদ্যবাহীরা মদ পোষাক ইত্যাদি বয়ে নিয়ে চলেছে, তখন সকলের মধ্যে যে ত্রাসের প্রকাশ আছে সেটা স্পষ্ট করতো খালেদ চৌধুরীর বেহালা। সকলের অন্তর যে কাঁপছে এইটা যেন মঞ্চের কথাবার্তা চলাফেরার পিছনে থর থর করতো। সেই দ্রুত ছোটো ছোটো স্ট্রোকের ক্রোমাটিক স্বরের বাজনা বদলে যেতো লম্বা উদ্ধত টানে- যখন নন্দিনী ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত রাজার দরজার ওপর।"। (সন্মার্গ সপর্যা - শম্ভু মিত্র)

— চার —

শম্ভু মিত্রের যে তিনটি নাট্যপ্রযোজনার আলোচনা আমরা করলাম তা ছাড়াও তিনি রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা ও বিসর্জন নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেছিলেন। মুক্তধারার কথা আগেই বলেছি; ঐ নাটকে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না। আর বিসর্জন নাটকটি এত বেশিবার এত রকম দলের দ্বারা অভিনীত হয়েছে যে ওখানে শম্ভু মিত্র কোনো মৌলিকতা আর আনতে পারবেন না বলেই মনে করেছিলেন। রবীন্দ্র শতবর্ষে বহুরূপীয় এই বিনেদনটি কিন্তু বাঙ্গালী দর্শক খুবই পছন্দ করেছিলেন। বিশেষত :জয়সিংহ চরিত্রে শম্ভু মিত্রের অভিনয় ছিল অনবদ্য।

রবীন্দ্রনাটক ছাড়াও বহুরূপী বিশ্ব মানের অনেক নাটক আমাদের সেদিন উপহার দিয়েছিল। তার মধ্যে দেশি ও বিদেশি, প্রাচীন ও আধুনিক সবই ছিল। সেই সব প্রযোজনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবে। তারপর একসময় শম্ভুমিত্র তাঁর অতি প্রিয় নাট্যজগৎ ছেড়ে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গেলেন। তাঁদের সেই সব পুরনো অভিনয়ের দু চারটে অডিও ক্যাসেট এখনও বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে পুরে ফেলবার জন্য সেখানে যে রকম ছাঁটকাট করা হয়েছে তাতে তাদের আসল প্রাণটুকুই গেছে হারিয়ে। প্রযোজনার সম্পূর্ণ চেহারা - তাদের মঞ্চসজ্জা, অবহসংগীত, আলো, রং, কথা ও নৈঃশব্দ সব নিয়ে যে পরিপূর্ণ চেহারা হত, তার কোনো দলিল আর নেই। আজকের দিনে, যখন চারদিকে ভিডিও শিল্পের এত বাড়বাড়ন্ত, যখন বিয়েবাড়ি আর পাড়ার ফাংশনের অসার ভিডিও তোলা হচ্ছে রাশি রাশি, তখন শম্ভু মিত্রের ঐ অবিস্মরনীয় প্রযোজনাগুলি দেখতে না পাওয়ার দুঃখ আমাদের বড়ই পীড়া দেয়।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়